The Chittagong University Journal of Arts and Humanities
ISSN 1993-5536
VOL.XXXVIII, 2022 (pp.165 - 172)
Published in July, 2025

বিদ্যাসাগরের পিতৃমাতৃভক্তি

অনিন্দিতা দাশ*

প্রতিপাদ্যসার: বাঙালির চেতনায় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর একজন পণ্ডিত ব্যক্তি, বাংলা গদ্যের জনক, সমাজ সংস্কারক এবং শিক্ষা সংস্কারক। তিনি পশ্চিমবঙ্গের মেদেনীপুর জেলার বীরসিংহ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন ১৮২০ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর। তাঁর প্রকৃত বা পারিবারিক নাম ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। পিতা ঠাকুরদাস বন্দোপাধ্যায় এবং মাতা ভগবতী দেবী। তিনি গ্রামের শিবচন্দ্র মল্লিকের বাড়ির পাঠশালায় পাঠ চুকিয়ে পিতার হাত ধরে কলকাতায় যান পড়াশোনার উদ্দেশে। সেখানে অধ্যয়ন শেষে কৃতিত্বের সাথে সকল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ায় 'বিদ্যাসাগর' উপাধি লাভ করেন। এরপর তিনি কর্মজীবন শুরু করেন ১৮৪১ সালে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে। সেখানে হেডপণ্ডিত হিসেবে বাংলা বিভাগে যোগদান করেন। পাঁচ বছর অতিক্রান্ত হলে তিনি সংস্কৃত কলেজে প্রথমে সহকারী সম্পাদক এবং কিছুকালের ব্যবধানে সেখানে অধ্যক্ষ পদে যোগদান করেন। এরপর তিনি বিশেষ বিদ্যালয় পরিদর্শক নিযুক্ত হন। এসময়ে তাঁর তত্ত্বাবধানে বিশটি মডেল স্কুল এবং পঁয়ত্রিশটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। এমনকী নিজ অর্থ ব্যয়ে তিনি মেট্রোপলিটন কলেজ (বিদ্যাসাগর কলেজ) স্থাপন করেন। এভাবে তাঁর শৈশবে পিতার সঙ্গে পড়াশোনার উদ্দেশে কলকাতায় যাওয়া থেকে শুরু করে শিক্ষকতা, বিদ্যালয় স্থাপন, মেয়েদের জন্য বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন, বিধবা নারীদের জন্য মুক্ত জীবনের চিন্তা তথা তাদের জন্য বিবাহ সংক্রান্ত সংস্কার, দুঃখী মানুষের পাশে দাঁড়ানো সহ নানাবিধ কর্মকাণ্ডের উদ্দীপনার পেছনে অনুপ্রেরণা ছিল তাঁর পিতামাতার। পিতামাতার প্রতি অগাধ শ্রদ্ধাবোধ তাঁকে পরিবার তথা সমাজের প্রতি দায়িত্বশীল হতে যে সহযোগিতা করেছে তা তাঁর জীবনাচরণ সম্পর্কে চর্চা করলে সহজেই অনুমান করা যায়। আলোচ্য প্রবন্ধে এই মহান ব্যক্তির পিতামাতার প্রতি ভক্তি সমন্ধীয় আলোচনা করা হয়েছে।

ভূমিকা

উনিশ শতকের এক 'অক্ষয় মনুষ্যত্ব'র প্রতীক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। বাংলা সাহিত্যাঙ্গনে ভাষা-সাহিত্যে সংস্কারের পাশাপাশি সমাজ সংস্কার করে বাঙালি জাতিকে গৌরবান্বিত করেছেন তিনি। বহু গুণের আধার এই মহান ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর চারিত্রপূজা নামক প্রবন্ধে বলেছেন,

> 'বিদ্যাসাগরের চরিত্রে যাহা সর্বপ্রধান গুণ– যে গুণে পল্লী-আচারের ক্ষুদ্রতা, বাঙালি-জীবনের জড়ত্ব, সবলে ভেদ করিয়া একমাত্র নিজের গতিবেগ প্রাবল্যে কঠিন প্রতিকূলতার বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া, হিন্দুত্বের দিকে নহে, সাম্প্রদায়িকতার দিকে নহে– করুণার অশ্রুজলপূর্ণ উন্মুক্ত অপার মনুষ্যত্বের অভিমুখে আপনার দৃঢ়নিষ্ঠ একাগ্র একক জীবনকে প্রবাহিত করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন...। বিদ্যাসাগরের জীবনীতে এই অনন্যসুলভ মনুষ্যত্বের প্রাচুর্যই সর্বোচ্চ গৌরবের বিষয়। তাঁহার সেই পর্বতপ্রমাণ চরিত্রমাহাত্ম্যে তাঁহারই কৃত কীর্তিকেও খর্ব করিয়া রাখিয়াছে'[১] (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ৭৬৭)।

* সহযোগী অধ্যাপক, সংস্কৃত বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

তাঁর সুরে সুর মিলিয়ে বলা যায়, বিদ্যাসাগরের জীবনবোধ তথা মনুষ্যত্বের জন্য তিনি অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছেন আজীবন। আর তাঁর এই জীবনবোধ তৈরিতে প্রভাবিত করেছেন তাঁর মাতাপিতা। প্রকৃতপক্ষে একটি শিশুর মনোজগৎ তৈরি হয় পারিবারিক পরিমণ্ডলে। এদিক থেকে বিচার করলে তাঁর পিতৃদেব ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং জননী ভগবতী দেবী ছিলেন অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্ব। এ দুজন ব্যক্তি নিজেদের সুখ-দুঃখের কথা না ভেবে সর্বদা পরহিতার্থে কাজ করেছেন, যার স্বাক্ষর কিনা বিদ্যাসাগরের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে দৃশ্যমান।

পিতা ঠাকুরদাস স্বল্প বেতনে কর্মরত ছিলেন। অতি কষ্টে তিনি সংসার চালিয়েছেন। বিদ্যাসাগরকে পাঁচ বছর বয়সে প্রথমে গ্রামের পাঠশালায় এবং ১৮২৯ সালে নয় বছর বয়সে কলকাতায় নিয়ে গিয়েছিলেন হিন্দু কলেজে পড়ানোর উদ্দেশ্যে। আর্থিক সঙ্কট থাকলেও তিনি বিদ্যাসাগরকে শিক্ষাজীবনে সর্বোচ্চ সুযোগ-সুবিধা দিতে চেয়েছেন। তিনি যেমন দারিদ্র্যকে উপেক্ষা করে পুত্রের প্রতি দায়িত্ব পালনে অবহেলা করেন নি; ঠিক তেমনি বিদ্যাসাগরও জীবনে সর্বাধিক প্রাধান্য দিয়েছেন তাঁর পিতামাতাকে। লেখাপড়া শেষে বিদ্যাসাগর ১৮৪১ সালে মাসিক পঞ্চাশ টাকা বেতনে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে প্রধান পণ্ডিতের পদে নিযুক্ত হন। এরপরই তিনি পিতৃদেবকে কর্মস্থল থেকে অবসর নেওয়ার জন্য প্রবলভাবে অনুরোধ করেন। কিন্তু পুত্রের উপর নির্ভরশীল হতে হবে ভেবে শুরুতে রাজি হন নি। তবে পুত্রের একান্ত অনুরোধে তিনি পরবর্তীকালে রাজি হন। প্রতি মাসের শুরুতে কুড়ি টাকা পিতৃদেবকে পাঠাতেন। আর অবশিষ্ট ত্রিশ টাকা দিয়ে তিন ভাই, দুজন পিতৃব্যপুত্র, দুজন পিতৃস্বস্রেয়, একজন মাতৃস্বস্রেয় ও ভৃত্য শ্রীরাম নাপিত সহ মোট নয় জনের ব্যয় নির্বাহ করতেন অতি কষ্টে।

কলেজে পড়াকালীন বিদ্যাসাগর মাসিক বৃত্তির সম্পূর্ণ টাকাই পিতৃদেবকে পাঠালে পুত্রের কাছে তিনি ইচ্ছা পোষণ করেছিলেন, পুত্রের পাঠানো অর্থ দিয়ে জমি ক্রয় করে বিদ্যালয় স্থাপনের। তিনি স্বপ্ন দেখতেন, এমন একটি বিদ্যালয় হবে যেখানে ছাত্রছাত্রীরা বিনা বেতনে বৃত্তিসহ লেখাপড়া করতে পারবে। পিতার ইচ্ছা পূরণ পুত্রের কর্তব্য মনে করতেন বিদ্যাসাগর। পিতার সেই স্বপ্নটিকে ধারণ করেছিলেন তাঁর অন্তরে। কিন্তু এ স্বপ্ন পূরণে বড় অন্তরায় ছিল অর্থসঙ্কট। ছাত্রজীবন শেষে কর্মজীবনে প্রবেশের পর একদিকে সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপনার জন্য মাইনে পেতেন তিনশ টাকা আর অন্যদিকে বেতালপঞ্চবিংশতি, জীবনচরিত, বাঙ্গালার ইতিহাস, উপক্রমণিকা, বোধোদয় প্রভৃতি পুস্তক প্রকাশিত হওয়ায় বেশ কিছু টাকা অর্জিত হয়। আর এ অর্থ দিয়ে তিনি পিতৃদেবের বিদ্যালয় স্থাপনের স্বপ্ন পূরণে ব্রতী হন। বিদ্যালয় স্থাপনের নিমিত্তে নিজবাড়িতে এসে পিতৃদেবের সমুখে দাঁড়িয়ে বলেন,

> 'আপনি দেশে টোল করিয়া দেশস্থ লোককে বিদ্যাদান করিবেন, ইহা বহুদিন পূর্বে মধ্যে মধ্যে ব্যক্ত করিতেন; এক্ষণে মহাশয়ের আশীর্বাদ প্রভাবে অবস্থা ভাল হইয়াছে, অতএব আমি বীরসিংহায় একটি বিদ্যালয় স্থাপন করতে মানস করিয়াছি' (ড. কুমুদকুমার ভট্টাচার্য ৬৯)।

বীরসিংহ গ্রামে বিদ্যালয়টি স্থাপনের পর তাঁর পিতামাতা ভীষণ আহ্লাদিত হয়েছিলেন। বিদ্যাসাগর সহস্রাধিক মুদ্রা দিয়েছিলেন পিতার হাতে নিজগ্রামে বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য। ১৮৫৩ সালে অবৈতনিক বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

বিদ্যাসাগর যখন বই লিখতে শুরু করেন সেখানে পিতৃমাতৃভক্তির পরিচয় মেলে। ১৯৫৫ সালে তিনি বর্ণ পরিচয় (১ম ও ২য় ভাগ) নামক বই লিখেন শিশুদের জন্য। এই বইয়ের ২য় ভাগে দশটি পাঠ রয়েছে। তন্মধ্যে অষ্টম ভাগের নাম পিতা-মাতা। এ রচনার প্রথমেই তিনি লিখেন,

বিদ্যাসাগরের পিতৃমাতৃভক্তি

> 'দেখ বালকগণ, পৃথিবীতে পিতা-মাতা অপেক্ষা বড়ো কেহই নাই।... তাঁহারা কত যত্নে, কত কষ্টে, তোমাদিগের লালন-পালন করিয়াছেন। তাঁহারা সেরূপ যত্ন ও সেরূপ কষ্ট না করিলে, কিছুতেই তোমাদের প্রাণরক্ষা হইত না' (ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রণীত ২৫)।

বিদ্যাসাগর প্রতিটি কাজের প্রারম্ভে পিতার অনুমতি নিতেন। তিনি কলকাতায় বাড়ি করার পূর্বে পিতার কাছে এসে বলেছিলেন বইয়ের সেল্‌ফ এক বাড়ি থেকে অন্য বাড়িতে স্থানান্তর করা অসুবিধা। একারণে কলকাতায় বাড়ি করতে পিতার অনুমতি চাইলে পিতৃদেব বলেন, 'তুমি পুস্তক রাখিবার উপলক্ষে বাটী প্রস্তুত করিবে, এ সংবাদে পরম সন্তোষলাভ করিলাম, ত্বরায় বাটী প্রস্তুতের উদ্যোগ কর' (ড. কুমুদকুমার ভট্টাচার্য ১৬৩)।

পিতৃদেব কাশীতে থাকাকালীন বিদ্যাসাগর মাঝে মাঝেই তাঁকে সেবাযত্ন করতে যেতেন। সেখানে তিনি নিজ হাতে রান্নাসহ পিতার যাবতীয় কাজ করে দিতেন। পিতৃদেবের জন্য আহার সাজিয়ে পাশে বসে থাকতেন এবং পিতার উচ্ছিষ্ট পাত্রে আহার করতেন। প্রতিদিন আহার শেষে মহাভারত পড়ে শোনাতেন। কাশী থেকে চলে যাওয়ার সময় পিতার সেবায় নিয়োজিত করতেন সহোদর শম্ভুচন্দ্রকে। কাশীতে পিতার পছন্দ অনুযায়ী ফল পাওয়া যেত না বিধায় সেগুলো কলকাতা থেকে পাঠিয়ে দিতেন।

পিতৃদেবের প্রতিটি কথা বিদ্যাসাগর আদেশ মনে করতেন। আর এ আদেশ পালনে তিনি ছিলেন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। পিতার মতের সাথে তাঁর মতবিরোধ থাকলে বিনা বাক্যে তিনি পিতার মত অনুসরণ করেছেন। নিজের ধর্মীয় আচারবিধির প্রতি অগাধ বিশ্বাস না থাকলেও পিতার সন্তুষ্টিলাভের জন্য পিতামহীর মৃত্যুর পর তিনি প্রচুর অর্থ ব্যয় করে শ্রাদ্ধ এবং শ্রাদ্ধের পরবর্তী বছরে সপিণ্ডন অনুষ্ঠান সম্পন্ন করেছেন। প্রায় তিন সহস্রাধিক ব্রাহ্মণ ভোজন করিয়েছেন। পিতৃদেবও এ আয়োজন সন্তুষ্ট হয়েছিলেন।

ধর্মবিষয়ে তেমন কোনো আগ্রহ ছিলনা বটে; পিতামাতা তাঁর কাছে পরম দেবতা তুল্য ছিলেন। যেমন: 'কাশীর ব্রাহ্মণদেরকে প্রচুর অর্থদানে বিদ্যাসাগর অসম্মতি জানালে তাঁরা তাঁকে প্রশ্ন করেছিলেন, 'আপনি কি তবে কাশীর বিশ্বেশ্বর মানেন না?' বিদ্যাসাগর উত্তর করেন, 'আমি তোমাদের কাশী বা তোমাদের বিশ্বেশ্বর মানি না।' 'আপনি তবে কি মানেন?' – এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, 'আমার বিশ্বেশ্বর ও অন্নপূর্ণা উপস্থিত এই পিতৃদেব ও জননীদেবী বিরাজমান" (আনিসুজ্জামান ১৬)।

ছোট ছেলে ঈশান ঋণগ্রস্ত হয়ে বনে বনে ঘুরে বেড়াচ্ছেন জেনে ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় দুঃখিত হন। তিনি তখন বিদ্যাসাগরকে সে ঋণ শোধ করে সপত্নী ঈশানকে ফিরিয়ে আনতে বলেছিলেন। বিদ্যাসাগর পূর্বেও একবার সহোদর ঈশানের ঋণ পরিশোধ করেছিলেন। আর একারণে পুনরায় একই কাজ করতে খুব একটা আগ্রহ বোধ না করলেও পিতার আদেশ পালনের জন্য তিনি সব ঋণ পরিশোধ করে তাদের দুজনকে পিতার কাছে অর্থাৎ কাশীতে প্রেরণ করেছিলেন।

১২৮৩ সালের ১লা বৈশাখ ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় কাশীলাভ করেন অর্থাৎ মারা যান। মৃত্যুর পূর্বে তিনি একটি উইল প্রস্তুত করে যান। তিনি উইলে তিনটি ইচ্ছের কথা জানিয়েছেন। তা হলো: ১. তাঁর মৃত্যুর সময় যেন জ্যেষ্ঠ পুত্র বিদ্যাসাগর পাশে থাকেন এবং দাহাদি কার্য সম্পন্ন করেন, ২. কাশীতে থাকাকালীন তিনি যেসব মহারাষ্ট্রীয় বেদজ্ঞ এবং হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণদের ভোজন করাতেন, বিদ্যাসাগর তাদের ভোজন করাবেন এবং ৩. বিদ্যাসাগর নিজে গয়ায় গিয়ে গয়াকৃত্য সম্পন্ন করবেন। কিন্তু বিদ্যাসাগর পিতার দাহাদি ক্রিয়া সম্পন্ন করলেও পরদিন তিনি ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়েন বলে উপস্থিত সকলের অনুমতি নিয়ে তিনি কলকাতায় ফিরে যান। তিনি সুস্থ হয়ে পরবর্তীসময়ে কাশীতে গিয়ে পিত্রাদেশ পালন করেন। যদিও তিনি পূর্বে ব্রাহ্মণদের দান না করায় বাক-বিতণ্ডা হয়েছে কিন্তু পিত্রাদেশ পালনে তিনি পিছপা হন নি।

পিতা ঠাকুরদাস এবং জননী ভগবতী দেবী দুজনেই ছিলেন মহৎ প্রাণের অধিকারী। সংসারের টানাপড়েনের বেড়াজালে আবদ্ধ না থেকে সমাজের কল্যাণে নিজেদের নিয়োজিত রেখেছিলেন। বাবামায়ের এমন মনোভাবের প্রভাব পড়েছিল পুত্রের উপর। তাঁদের কোনো ইচ্ছা অপূরণ রাখেন নি বিদ্যাসাগর। পিতৃদেব স্বল্প আয়ে কর্মরত থাকায় জননী দেবী চরখায় সূতা কেটে মোটা কাপড় তৈরি করে কলকাতায় পুত্রকে পাঠাতেন। বিদ্যাসাগর মায়ের হাতে তৈরি সেই কাপড় পরিধান করেই বের হতেন। এমনকী কর্মজীবনে তিনি প্রতিষ্ঠা লাভ করলেও সর্বদা মোটা কাপড় পরতেন। মায়ের প্রতি এরূপ ভক্তি প্রদর্শন করেছেন আজীবন।

জননী ভগবতী দেবীর জীবনবোধ মধ্যবিত্ত সাধারণ নারীর মতো ছিল না। তিনি সর্বদা সীমার মধ্যে থেকে অসীমে বিচরণ করেছেন। আমাদের সমাজে অন্তঃপুরে থাকা নারীর স্বাতন্ত্র্য প্রকাশ বিরল। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জীবনদর্শন অনুধাবন করলে দেখা যায়, তিনি তাঁর মায়ের আদর্শকে অনুসরণ করেছেন। ভগবতী দেবী নিজে জাতিভেদ প্রথা মেনে চলেন নি। তিনি হেরিসন সাহেবকে নিমন্ত্রণ করে নিজে হাতে ভোজন করিয়েছেন। তাঁর উদার স্বভাব, উন্নত মন এবং সংস্কারহীন আচরণ দেখে হেরিসন সাহেব বিদ্যাসাগরকে বলেছিলেন, 'মাতার গুণেই আপনি এরূপ স্বভাবত উন্নতমনা হইয়াছেন' (ড. কুমুদকুমার ভট্টাচার্য ১৪৫)।

বিদ্যাসাগরের জীবনে তাঁর মায়ের প্রভাব অনেক। মানুষের প্রতি মমতা, দুঃখী মানুষের পাশে দাঁড়ানো, উদার হস্তে দান সহ প্রভৃতি মানবিক কাজের অনুপ্রেরণা পেয়েছেন মায়ের কাছ থেকে। শৈশবে তিনি দেখেছেন মাতা ভগবতী দেবী মানুষকে ভোজন করাতে পছন্দ করতেন। গ্রামে বিদ্যালয় স্থাপিত হলে সেখানে দরিদ্র শিক্ষার্থীদের নিজ হাতে রান্না করে খাওয়াতেন। বাড়িতে রোগী আসলে রোগীদের উপযোগী নিরামিষ ব্যঞ্জন, মাছের ঝোল নিজেই তৈরি করে দিতেন। এমনকী তাদের মলমূত্র পরিষ্কার করতেও সঙ্কোচ ছিল না মায়ের। গরীব-দুঃখী-অসহায় মানুষের জন্য তাঁর মন কেঁদে উঠত। যাদের বস্ত্র ছিল না তাদের বস্ত্র দান করার পাশাপাশি বিপদগ্রস্ত মানুষকে অর্থ দিয়েও সাহায্য করতেন। এই অসহায় মানুষদের কথা ভেবে তিনি বাড়ির বাইরে পর্যন্ত যেতে বা থাকতে চাইতেন না। ১২৭৫ সালে একবার চৈত্রমাসে বাড়িতে আগুন লেগে সব ভস্মীভূত হলে বিদ্যাসাগর কলকাতা থেকে এসে মাকে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। কিন্তু এসব অসহায় মানুষকে কে রান্না করে খাওয়াবে ভেবে তিনি যেতে রাজি হন নি। এরপর ১২৭৬ সালে বিদ্যাসাগর কাশীবাসের উদ্দেশে পিতৃদেবের নিকট জননীকে প্রেরণ করেন। কিন্তু সেখানেও বেশি দিন মন স্থির রাখতে পারেন নি তিনি। তিনি পিতৃদেবকে বলেছিলেন,

> 'এখন হইতে এস্থলে অবস্থিতি করা অপেক্ষা আমরা দেশে অবস্থিতি করিলে, অনেক অক্ষম দরিদ্র লোককে ভোজন করাইতে পারিব। দেশে বাস করিয়া প্রতিবাসিবর্গের অনাথ শিশুগণের আনুকূল্য করিতে পারিলে, আমার মনের সুখ হইবে। আমার মৃত্যুর এখনও বিলম্ব আছে, আমি আমার সময় বুঝিয়া আসিব' (ড. কুমুদকুমার ভট্টাচার্য ১৪৯)।

মায়ের প্রতি অগাধ শ্রদ্ধাবোধ থেকে বিদ্যাসাগর সবসময় মায়ের পাশে থেকে মনবাঞ্ছা পূরণ করতেন। এমনকী সাধ্যেও বাইরেও তিনি মায়ের ইচ্ছা পূরণে মানুষকে সাহায্য করার জন্য যা-ই প্রয়োজন হতো, যত দ্রুত সম্ভব তা ব্যবস্থা করে দিতেন। প্রথমে চতুর্থ সহোদর হরচন্দ্র বিসূচিকা রোগে আক্রান্ত হয়ে এবং এরপর পঞ্চম সহোদর হরিশ্চন্দ্র একই রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেলে ভগবতী দেবী ভীষণ ভেঙ্গে পড়েছিলেন। তখন ভ্রাতৃহারা হয়ে এবং মায়ের শোকাতুর অবস্থা দেখে বিদ্যাসাগর হতবিহ্বল হয়ে পড়েন। তিনি মায়ের দুঃখ মোচনের লক্ষ্যে মাকে কলকাতায় নিয়ে আসেন। মা মানুষকে খাওয়াতে পছন্দ করতেন বলে বিদ্যাসাগর আত্মীয়স্বজন এবং বন্ধুদের

বাড়িতে নিয়ে আসতেন এবং মাতৃদেবী রান্না করে নিজ হাতে ভোজন করাতেন। জননীকে সন্তুষ্ট করার জন্যে তিনি প্রায় পাঁচ মাস নির্বিঘ্নে বহু অর্থ ব্যয় করেছেন।

মানুষকে ভালোবাসার এ গুণটি মায়ের কাছ থেকে পেয়েছিলেন বিদ্যাসাগর। ১২৭৩ সালের দুর্ভিক্ষের সময়ে গ্রামের মানুষের খোঁজ নিতে গিয়ে দেখেন কোনোরকমে তারা একবেলা ভোজন করেন। একথা শুনে বিদ্যাসাগর আবেগতাড়িত হয়ে মায়ের কাছে জিজ্ঞেস করেছিলেন, একদিনের পূজার জন্য ছয়-সাত টাকা বৃথা খরচ করা ভালো; নাকি গ্রামের অসহায় অনাথ মানুষের জন্য অবস্থানুসারে মাসে মাসে টাকা দিয়ে সাহায্য করা ভালো? একথা শুনে মাতৃদেবী বিনা দ্বিধায় বলেছিলেন,

> 'গ্রামের দরিদ্র নিরুপায় লোক প্রত্যহ খাইতে পাইলে, পূজা করিবার আবশ্যক নাই। তুমি গ্রামবাসীদিগকে মাসে মাসে কিছু কিছু দিলে, আমি পরম আহ্লাদিত হইব' (ড. কুমুদকুমার ভট্টাচার্য ১৪২)।

মায়ের কাছ থেকে বিদ্যাসাগর অনুপ্রাণিত হয়ে অসহায় মানুষের পাশেই দাঁড়িয়েছিলেন।
বিদ্যাসাগরের সমাজ সংস্কারমলূক কর্মকাণ্ডে একটি উল্লেখযোগ্য কাজ হচ্ছে বিধবাদের পুনরায় বিবাহ দেয়ার বিষয়ে উদ্যোগ নেওয়া। এ কাজের অন্তরালে তাঁর মায়ের অগ্রণী ভূমিকা রয়েছে। বীরসিংহ গ্রামের নিজ বাড়িতে একদিন মাতা ভগবতী একটি মেয়ের বৈধব্য উল্লেখ করে চণ্ডীমণ্ডপে এসে ছেলের কাছে জানতে চান, 'তুই এতদিন যে শাস্ত্র পড়িলি, তাহাতে বিধবাদের কোনও উপায় আছে কি না?' (ড. কুমুদকুমার ভট্টাচার্য ৮০)। এ প্রশ্নের অন্বেষণ করতে গিয়ে ঈশ্বরচন্দ্র পরবর্তীকালে বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব নামক পুস্তক রচনা করেন। তবে পুস্তক প্রকাশের পূর্বে তিনি অনুমতি চেয়েছিলেন পিতামাতার কাছে। পিতা ঠাকুরদাস ছেলেকে বলেছিলেন তিনি যদি অনুমতি না দেন তাহলে পুস্তকটি প্রকাশ হবে না! বিদ্যাসাগর উত্তরে বলেছিলেন পিতা জীবিত থাকতে প্রকাশ করবেন না। আত্মপ্রত্যয়ী ছেলেকে দেখে পিতা নিঃসংশয়ে অনুমতি দেন। কেবল তাই নয়; পুস্তকটিতে ধর্মশাস্ত্রানুযায়ী বিধবা বিবাহকে গ্রহণযোগ্য করে উপস্থাপন করেছেন জেনে তিনি পুত্রকে পরামর্শ দিয়েছিলেন লোকনিন্দা বা অপর কোনো কারণে যেন পিছু না হটে। অন্যদিকে মাতার কাছে গেলে ভগবতী দেবী বলেছিলেন, 'কিছুমাত্র আপত্তি নাই, লোকের চক্ষুঃশূল, মঙ্গল কর্মে অমঙ্গলের চিহ্ন, ঘরের বালাই হইয়া নিরন্তর চক্ষের জলে ভাসিতে ভাসিতে যাহাদের দিন কাটিতেছে, তাহাদিগকে সংসারে সুখী করিবার উপায় করিবে, এতে আমার সম্পূর্ণ মত আছে।' (ড. কুমুদকুমার ভট্টাচার্য ২০১)। বাবা-মায়ের অনুমতি নিয়ে বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব নামক ২য় খণ্ডটিও প্রকাশ করেন এবং দেশজুড়ে মানুষের সমালোচনা আর তোপের মুখেও পিছপা হননি। এভাবে কাজের প্রতি একাগ্রতা, ধৈর্য এবং নিষ্ঠার সাথে দায়িত্বশীল থেকে তিনি যেন পিতামাতারই অনুগত থেকেছেন। সন্তান হয়ে তাঁদের যেকোনো ইচ্ছা পূরণ করেছেন আনুগত্যের সাথে। পিতামাতার প্রতি বিদ্যাসাগরের শ্রদ্ধা প্রদর্শনের এমন উদাহরণ নজিরবিহীন।

পিতৃমাতৃভক্ত বিদ্যাসাগর কেবল বিধাব-বিবাহ সংক্রান্ত পুস্তক প্রকাশ করেই থেমে যান নি; বরং সমাজে এই বিবাহকে গ্রহণযোগ্য করার জন্য নিজের পত্নী আর আত্মীয়স্বজনদের আপত্তি সত্ত্বেও নিজের একমাত্র ছেলেকে কৃষ্ণনগরবাসী ভবসুন্দরী নামে এক বিধবা নারীর সঙ্গে বিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি বিধবা বিবাহকে তাঁর জীবনের প্রধান সৎকর্ম বলে মনে করতেন। ভ্রাতা শম্ভুচন্দ্রকে একটি চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন,

> 'আমি বিধবাবিবাহের প্রবর্তক; আমরা উদ্‌যোগ করিয়া অনেকের বিবাহ দিয়াছি, এমন স্থলে আমার পুত্র বিধবাবিবাহ না করিয়া কুমারী-বিবাহ করিলে, আমি লোকের নিকট মুখ দেখাইতে পারিতাম না। ভদ্রসমাজে নিতান্ত হেয় ও অশ্রদ্ধেয় হইতাম। নারায়ণ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া এই বিবাহ করিয়া, আমার মুখ উজ্জ্বল করিয়াছে এবং লোকের নিকট আমার পুত্র বলিয়া পরিচয় দিতে পারিবে, তাহার পথ

করিয়াছে। বিধবাবিবাহ-প্রবর্তন আমার জীবনের সর্বপ্রধান সৎকর্ম। এজন্মে যে ইহা অপেক্ষা অধিকতর আর কোনও সৎকর্ম করিতে পারিব, তাহার সম্ভাবনা নাই। এ বিষয়ের জন্য সর্বস্বান্ত হইয়াছি এবং আবশ্যক হইলে প্রাণান্ত স্বীকারেও পরাঙ্মুখ নহি' (ড. কুমুদকুমার ভট্টাচার্য ১৫১-১৫২)।

তাঁর এ বক্তব্যের মধ্যে একথা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান যে, মায়ের বিধবা নারীদের প্রতি যে মমতা ও কষ্ট ছিল তা বিদ্যাসাগর ভীষণভাবে হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের চরিত্রের একটি বিশেষ গুণ দৃঢ়তা অর্থাৎ আত্মপ্রত্যয়। এই গুণটির জন্যই শত বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও তিনি তাঁর পিতামাতার প্রতিটি ইচ্ছা বা পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করেছেন। মা-বাবার প্রতি অগাধ শ্রদ্ধা-ভক্তি ছিল বলে তিনি তাঁদের ইচ্ছাপূরণকে কর্তব্য বলে মনে করতেন। বিহারীলাল সরকারের বিদ্যাসাগর নামক গ্রন্থ থেকে জানা যায়, ফোর্ট উইলিয়ম্ কলেজে কর্মরত অবস্থায় মায়ের চিঠি আসে তাঁর হাতে। সেখানে লেখা ছিল: 'তুমি অতি অবশ্য আসিবে।' মাতৃভক্ত বিদ্যাসাগর মার্সেল সাহেবের কাছে ছুটি প্রার্থনা করেও যখন ছুটি পেলেন না তখন কর্ম পরিত্যাগ করার মতো কঠিন সিদ্ধান্ত নিতেও কুণ্ঠিত হন নি। তাঁর মায়ের প্রতি ভক্তির দৃঢ়তা দেখে ছুটি মঞ্জুর করেছিলেন মার্সেল সাহেব। এরপর বেলা তিনটায় এক ভৃত্যকে সঙ্গে নিয়ে অত্যন্ত বৈরী আবহাওয়ার মধ্যে বাড়ির উদ্দেশে রওনা হন। কিন্তু পথিমধ্যে ভৃত্য ক্লান্ত হয়ে পড়লে কিছু পয়সা দিয়ে তাকে বাড়ি যেতে বলে দ্রুত বিদ্যাসাগর চলতে আরম্ভ করেন। ক্রমে তিনি উপস্থিত হলেন খরস্রোতা দামোদর নদের তীরে। সেখানে নৌকার জন্য অপেক্ষা পর্যন্ত করতে পারেন নি। অন্নপূর্ণা মাতৃমূর্তি চিন্তা করতে করতে মা মা বলে নদীতে ঝাপ দিয়ে সাঁতরে পার হলেন। এরপর দ্বারকেশ্বর নদও সাঁতরে পার হলেন। এভাবে তিনি রাত নয়টায় বাড়ি পৌঁছেছিলেন। যদিও সহোদর শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন তাঁর গ্রন্থে লিখেছেন, ভৃত্যের বাড়ি পাতুল গ্রামে। সেখানে যেতে হলে দামোদর নদ পার হয়ে আরো প্রায় পাঁচ ক্রোশ যেতে হয়। দুজনেই পাতুল গ্রাম পর্যন্ত একসঙ্গে গিয়েছিলেন। ভৃত্যের বাড়িতে রাত্রিযাপন করে পরদিন সকালে বিদ্যাসাগর একা বাড়ি গিয়েছিলেন।

বিদ্যাসাগর পিতামাতাকে নিজের জীবনে সর্বোচ্চ স্থানে বসিয়েছিলেন। তাঁর জীবনের নানা ঘটনাপ্রবাহে এ বিষয়ক সত্যতা পাওয়া যায়। যেমন তিনি একবার পিতাকে দেখতে কাশীতে গিয়েছিলেন। সেখানে কিছু ব্রাহ্মণ তাঁর কাছে পাঁচ-সাত হাজার টাকা দাবি করেন। বিদ্যাসাগর অপারগতা প্রকাশ করলে ব্রাহ্মণেরা ক্ষিপ্ত হয়ে জানতে চান তাঁর বিশ্বেশ্বরের প্রতি বিশ্বাস আছে কি না? বিদ্যাসাগরের সঙ্গে কাশীবাসী ব্রাহ্মণদের এবিষয়ে বাক-বিতণ্ডা হলে তিনি বলেছিলেন,

> 'আমার বিশ্বেশ্বর ও অন্নপূর্ণা উপস্থিত এই পিতৃদেব ও জননীদেবী বিরাজমান। দেখ জননীদেবী আমাকে দশ মাস গর্ভে ধারণ করিয়া কতই কষ্ট ভোগ করিয়াছেন। বাল্যকালে আমাকে স্তনদুগ্ধ পান করাইয়া পরিবর্ধিত করিয়াছেন। আমার জন্য কতই কষ্ট ভোগ করিয়াছেন, কতই যত্ন পাইয়াছেন। আমি পীড়িত হইলে জননী, আহার-নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া, কিসে আমি আরোগ্য লাভ করি, নিরন্তর এই চিন্তায় নিমগ্ন হইতেন। পিতৃদেব কত কষ্ট স্বীকার করিয়া আমাকে লেখাপড়া শিখাইয়াছেন, বাল্যকালে অন্ন-বস্ত্র দিয়াছেন। পিতামাতার আন্তরিক যত্নেই আমি পরিবর্ধিত হইয়াছি। পিতা, বাল্যকালে আমাকে স্কন্ধে আরোহণ করাইয়া, লেখাপড়া শিক্ষার জন্য কলিকাতায় লইয়া গিয়াছিলেন। তথায় আমার পীড়া হইলে, মলমূত্রাদি পরিষ্কার করিয়া দিয়াছেন। সুতরাং এতাদৃশ জনকজননীকেই আমি পরমেশ্বর জ্ঞান করি, এবং সেইরূপই আমি শ্রদ্ধা-ভক্তি করিয়া থাকি। ইঁহাদিগকে অসন্তুষ্ট করিলে, বিশ্বেশ্বর ও অন্নপূর্ণা আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হইবেন। পিতামাতাকে অসন্তুষ্ট করিলে, সকল দেবতাই আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হইবেন' (ড. কুমুদকুমার ভট্টাচার্য ১৫৪)।

বিদ্যাসাগরের পিতৃমাতৃভক্তি

মানবদরদী ঈশ্বরচন্দ্র দরিদ্র, অসহায় মানুষকে অর্থসহ বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করতেন। সহজভাবে বলতে গেলে মানুষের কষ্টে তাঁর মন কেঁদে উঠত। মানুষকে সহযোগিতা করার নেশা জেগে ওঠার উৎস তাঁর মা। একদিন বীরসিংহ গ্রামের কুলীন স্বামীর পরিত্যক্তা স্ত্রী বিন্ধ্যবাসিনী দেবী বার্ধক্যবয়সে বিদ্যাসাগরের কাছে এসে বললেন, 'বাবা বিদ্যাসাগর! তোমার জননী আমাকে মাসে দুই টাকা করিয়া দিতেন, তাঁহার মৃত্যুর পর তোমার পিতা আমাকে আর দেন না; আমার বড়ই কষ্ট হইয়াছে' (ড. কুমুদকুমার ভট্টাচার্য ১৬০)। একথা শুনে তিনি মাসিক তিন টাকা হারে দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। এভাবে কাশীলাভের পূর্ব পর্যন্ত তাকে বারো বছর পর্যন্ত মাসহারা দিয়েছেন। কেবল এই অসহায় নারীই নয়; তিনি তাঁর বাল্যবন্ধু মদনমোহন তর্কালঙ্কারের মৃত্যুর পর তাঁর মাতা বিশ্বেশ্বরী দেবীকে 'মা' সম্বোধন করে প্রথম দশ বছর দশ টাকা হারে এবং পরবর্তীসময়ে অতিরিক্ত আরো দেন। আঠারো বছর পর্যন্ত তিনি টাকা পাঠাতেন কাশীতে। তাঁর বন্ধু অমৃতলাল মিত্রের অনুরোধে তারাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়কে মাসিক চার টাকা, বাপুদেব শাস্ত্রীকে মাসিক দুই টাকা, মায়ের অনুরোধে পিতৃদেবের পিতৃস্বসার কন্যা নিস্তারিণী দেবীকে মাসিক চার টাকা তেরো বছর, বাবার বেদপাঠী পুরোহিত চিন্তামণি ভট্টকে মাসিক তিন টাকা এবং রামমাণিক্য তর্কালঙ্কার মহাশয়কে প্রথমে মাসিক দশ টাকা হারে এবং পরবর্তীসময়ে অথর্ব হলে আরো পাঁচ টাকা বাড়িয়ে মোট পনের টাকা করে পনের বছর পর্যন্ত দিয়েছেন। এছাড়াও দৈনন্দিন জীবনে বিশ-বাইশ টাকা দুস্থ মানুষের সেবায় নিয়েজিত করতেন।

বিনয় ঘোষ তাঁর বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ নামক গ্রন্থে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের লেখা কিছু চিঠিপত্রের উল্লেখ করেছেন যেখানে পিতামাতাকে লেখা তিনটি চিঠি রয়েছে। প্রতিটি চিঠির সমাপ্তিতে নিজের নামের পূর্বে 'ভৃত্য' যুক্ত করে 'ভৃত্য শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মণ' লিখেছেন। এসব চিঠির প্রতিটি চরণ যেন পিতামাতার প্রতি অগাধ শ্রদ্ধা এবং ভক্তির নিদর্শন। সংসারের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে সংসার ত্যাগ করবেন বলে মন স্থির করলেন ঈশ্বরচন্দ্র। তবে তার পূর্বেও তিনি পিতামাতার কাছে পত্র দিয়েছেন। এমনই এক চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন,

> '...স্থির করিয়াছি, যতদূর পারি নিশ্চিত হইয়া জীবনের অবশিষ্ট ভাগ নিভৃত ভাবে অতিবাহিত করিব। এক্ষণে আপনার শ্রীচরণে এ জন্মের মত বিদায় লইতেছি। মাতার নিকট পুত্রের পদে পদে অপরাধ ঘটিবার সম্ভাবনা। সুতরাং আপনকার শ্রীচরণে কতবার কত বিষয়ে অপরাধী হইয়াছি, তাহা বলা যায় না। এজন্য কৃতাঞ্জলিপুটে বিনীত বচনে প্রার্থনা করিতেছি, কৃপা করিয়া এ অধম সন্তানের সমস্ত অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন। আপনকার নিত্য নৈমিত্তিক ব্যয় নির্ব্বাহের নিমিত্ত মাস মাস যে ত্রিশ টাকা পাঠাইয়া থাকি যতদিন শরীর ধারণ করিবেন কোন কারণে তাহার ব্যতিক্রম ঘটিবেক না। তদ্ব্যতিরিক্ত আপনকার পিতৃকৃত্য ও মাতৃকৃত্যের ব্যয় নির্ব্বাহার্থে বার্ষিক দুইশত টাকা প্রেরিত হইবেক। যদি কখন কোন বিষয়ে আমার কিঞ্চ বলা আবশ্যক বোধ করেন পত্র দ্বারা লিখিয়া পাঠাইবেন। আমি অনেকবার আপনকার শ্রীচরণে নিবেদন করিয়াছি এবং পুনরায় শ্রীচরণে নিবেদন করিতেছি যদি আমার নিকট থাকা অভিমত হয়, তাহা হইলে আমি আপনাকে কৃতার্থ বোধ করিব এবং আপনকার চরণ সেবা করিয়া চরিতার্থ হইব' (বিনয় ঘোষ ৪৫৫)।

১২৭৭ সালের ফাল্গুন মাসে জননীদেবী কাশীতে পিতৃদেবের নিকট থাকাকালীনও বিদ্যাসাগরকে দিয়ে অসহায় নারীদের অন্নকষ্ট দূর করেছেন। সেখানে দুই মাস যাপনের পর তিনি বিসূচিকা রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান। তাঁর মৃত্যুসংবাদ বিদ্যাসাগকে ভীষণ শোকাহত করেছে। তিনি দিনরাত কেবল রোদনই করতেন। শ্রাদ্ধকার্য সমাপ্ত হয়ে গেলেও তিনি এক বছর নিজ হাতে নিরামিষ রান্না করে একবেলা খেয়েছেন। সেই বছরে তিনি কোনোরূপ পালঙ্ক, পাদুকা বা সুখদ্রব্য ব্যবহার করেন নি। মাতৃদেবী ছিলেন তাঁর প্রতিটি কাজের অনুপ্রেরণা। মায়ের অনুপস্থিতি তাঁর জীবনের গতিকেই যেন থামিয়ে দিয়েছিল।

এক অতি সাধারণ পরিবারের সন্তান বিদ্যাসাগর। অথচ এই ছেলেটিই একদিন জগদ্বিখ্যাত হয়ে উঠেছেন। বিদ্যাসাগর শৈশব থেকেই মেধাবী ছিলেন এটা ঠিক; তবে কেবল মেধার কারণেই মানুষের মধ্যে মনুষত্ববোধ, কাজের প্রতি একাগ্রতা, সততা, নিষ্ঠা তৈরি হয় না। এসব গুণ অর্জন করার ক্ষেত্রে পারিবারিক শিক্ষা বড্ড গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যা তিনি পেয়েছিলেন তাঁর পিতামাতার কাছ থেকে। উল্লিখিত বিদ্যাসাগরের প্রতিটি কাজের সফলতার পেছনে বাবা-মায়ের ইচ্ছা, অনুপ্রেরণা তো ছিলই; এর পাশাপাশি বিদ্যাসাগর যেন অদম্য গতিতে এগিয়ে যেতে পারেন সেক্ষেত্রে তাঁরা দিয়েছেন সাহস। আর অর্থনৈতিক সীমাবদ্ধতাকে ছাপিয়ে তিনি মানুষের পাশে দাঁড়াতে পেয়েছিলেন। বাবামায়ের প্রতি ভক্তি প্রদর্শনে তিনি ছিলেন আপোষহীন যার ফলাফলস্বরূপ তিনি যেকোনো কাজ নিরলসভাবে করেছেন এবং পেয়েছেন সাফল্য। বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'মানুষের প্রতি অকুণ্ঠ প্রেম, মানববেদনার প্রতি অগাধ সহানুভূতি এবং মানবদুঃখ দূর করবার জন্য সর্বস্ব ত্যাগ তাঁকে বৈরাগ্যধর্মী করেনি, বরং তাঁর মানসশক্তিকে বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে' (অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ২০৫) প্রকৃতপক্ষে, সমাজকে কলুষমুক্ত করতে যিনি নবযুগের আলোকবর্তিকা নিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন তিনি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। পিতামাতার কাছ অনুপ্রাণিত হয়ে মানবদরদী এই মানুষটি সমাজ সংস্কারে, শিক্ষা সংস্কারে অশেষ মহৎ কর্ম করেছেন। বিদ্যাসাগরের পিতৃমাতৃভক্তি যুগ যুগ ধরে চির স্মরণীয়, অনুকরণীয় হয়ে থাকবে।

তথ্যসূত্র

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বিদ্যাসাগরচরিত, চারিত্রপূজা, *রবীন্দ্রসমগ্র ২য় খণ্ড*। প্রথম প্রকাশ, পাঠক সমাবেশ, ২০১১।

ড. কুমুদকুমার ভট্টাচার্য (সম্পাদিত)। বিদ্যাসাগর জীবনচরিত ও ভ্রমনিরাস। শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন, ১৯৯২।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রণীত। বর্ণপরিচয়। ১৩৯১।

বিনয় ঘোষ (সম্পাদিত)। *বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ*। ২০১১।

আনিসুজ্জামান। *বিদ্যাসাগর ও অন্যেরা*। ২০১৮।

অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। বাংলা সাহিত্যে বিদ্যাসাগর। ২০০৫।

সহায়ক গ্রন্থাবলি:

বিশ্বনাথ দে (সম্পাদিত)। *বিদ্যাসাগর স্মৃতি*। ১৯৯২।

শ্রীপ্রহ্লাদকুমার প্রামাণিক (সম্পাদিত), বিহারীলাল সরকার প্রণীত। *বিদ্যাসাগর*। ১৯৯১।